জীবনের শেষ তিনটি ছবিতে সত্যজিৎ রায় আলাদা কেন

কাব্যময়তা নয়, প্রতিবাদ

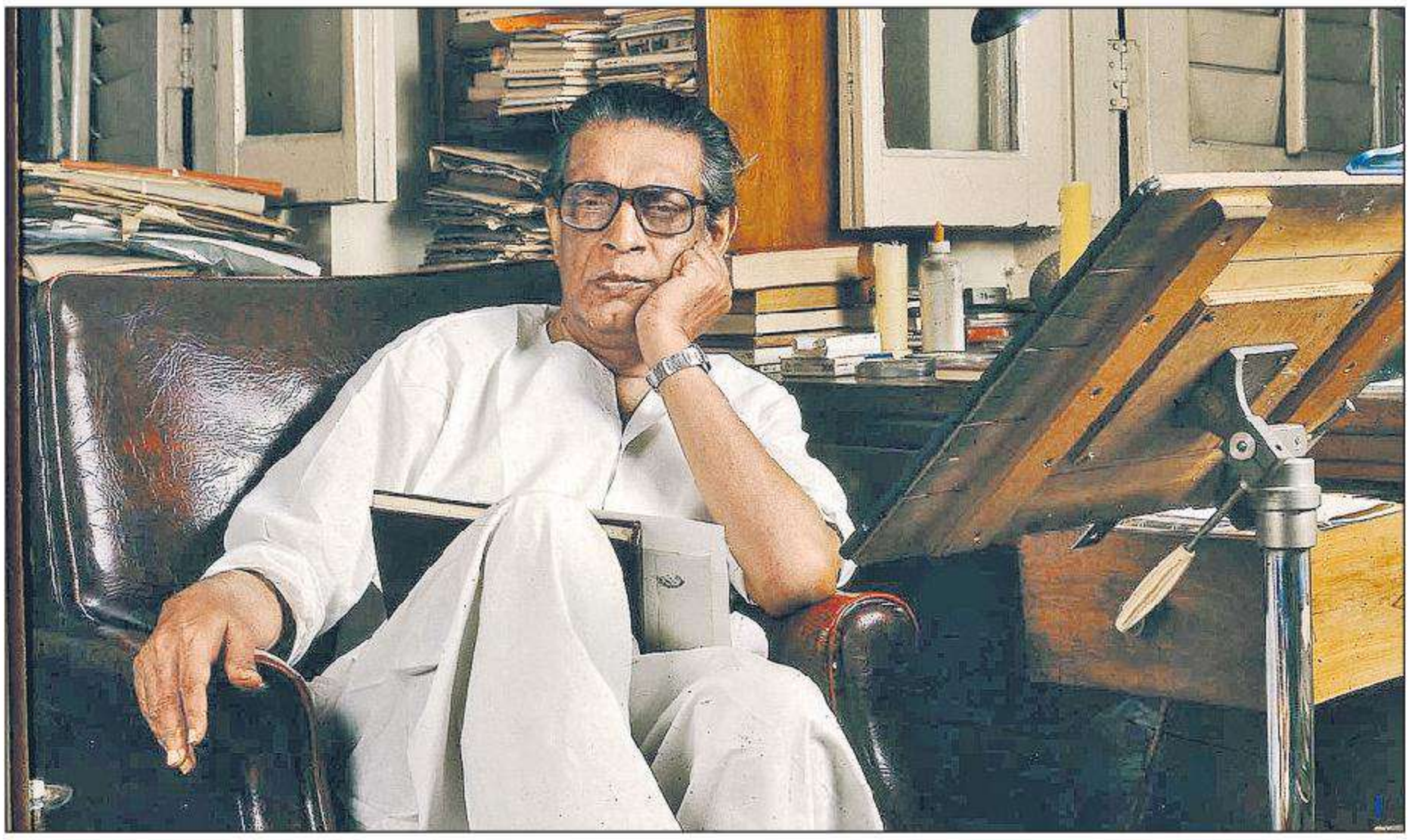

পুনর্জিৎ রায়চৌধুরী

সত্যজিৎ রায়ের শেষ তিনটি ছবি *গণশত্রু* (১৯৮৯), *শাখাপ্রশাখা* (১৯৯০) এবং *আগন্তুক* (১৯৯১)। এই ছবি তিনটিকে তাঁর সেরা কাজের মধ্যে ধরা তো হয়ই না, খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবেও বিবেচনা করা হয় না। সত্যজিতের জীবনীকার অ্যান্ড্রু রবিনসন এবং আরও অনেকের লেখা থেকে জানা যায় যে, মুক্তির পর ছবিগুলি চিত্র-সমালোচকদের দাক্ষিণ্য পায়নি একেবারেই— না দেশে, না বিদেশে। যে ছবিটিকে সত্যজিৎ নিজে মনে করতেন তাঁর 'ম্যাগনাম ওপাস', সেই *শাখাপ্রশাখা* সম্পর্কে তো বিরূপ মন্তব্য এসেছিল বিদগ্ধ চিত্র-সমালোচক ও সত্যজিতের বহুকালের বন্ধু চিদানন্দ দাশগুপ্তর তরফ থেকেই!

আমি চলচ্চিত্রবিশারদ নই। তাই 'উৎকৃষ্ট ছবি' হয়ে ওঠার জন্য কোনও ছবির মধ্যে কী কী গুণাগুণ থাকা দরকার, এবং সত্যজিতের শেষ তিনটি ছবির মধ্যে সেই সমস্ত ছিল কি না, তা নিয়ে মন্তব্য করব না। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে যেটা বরাবর মনে হয়ে এসেছে সেটা এই যে, তিনটি ছবিই সামাজিক ভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ প্রত্যেকটির কেন্দ্রেই এমন বিষয়, সমাজে যা কোনও দিন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে না— *গণশত্রু*-তে দেখতে পাই রাষ্ট্র নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কী ভাবে ধর্মকে ব্যবহার করে, এবং বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অস্বীকার করে; *শাখাপ্রশাখা*-র বিষয়বস্তু দুর্নীতি এবং সমাজে সেই দুর্নীতির স্বাভাবিকীকরণ; *আগন্তুক* প্রশ্ন তোলে বস্তুবাদী বুর্জোয়া সমাজকে নিয়ে, সেই সমাজের রীতিনীতি নিয়ে। তা সত্ত্বেও, যে-হেতু ছবিগুলিকে 'আর্টিস্টিক প্রোজেক্ট হিসাবে সফল নয়' বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে-হেতু সেগুলিকে চিরকালই যেন খানিকটা ব্রাত্য করে রেখেছি আমরা, সঙ্কোচ বোধ করেছি নিজেদের পছন্দের ছবির তালিকায় ঠাঁই দিতে।

শেষ তিনটি ছবির বিষয়বস্তু সত্যজিতের অন্যান্য ছবিতে উঠে আসেনি, এমন দাবি করার প্রশ্ন নেই— *দেবী*-তে সমাজে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও প্রগতিশীলতার দ্বন্দ্ব ধরা পড়েছিল; *অভিযান* এবং *জনঅরণ্য*-তে উঠে এসেছিল সামাজিক দুর্নীতির কথা; *অরণ্যের দিনরাত্রি*-তে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল বুর্জোয়া সমাজের মেকি রীতিনীতি নিয়েও। কিন্তু এই ছবিগুলির প্রত্যেকটিই বহুস্তরযুক্ত এবং কাব্যময়— এগুলিতে সমাজের নানা অন্ধকার দিক উঠে এলেও, তা উঠে এসেছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে (কখনও প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত হিউমারের সঙ্গে মিশে), সরাসরি নয় একেবারেই। অন্য দিকে, শেষ তিনটি ছবিকে কোনও মতেই বহুস্তরীয় এবং কাব্যময় বলা যায় না। বরং ছবিগুলিকে বলা যায় স্পষ্টত সামাজিক ছবি, যেগুলির মধ্যে দিয়ে সমাজের নানা সমস্যাকে গুরুত্ব সহকারে সরাসরি ও সোজাসাপ্টা ভাবে দর্শকদের কাছে পেশ করতে চেয়েছিলেন তিনি।

বহুস্তরযুক্ত এবং কাব্যময় ছবি তৈরি করা বন্ধ করে শেষ জীবনে স্পষ্টত সামাজিক ছবি তৈরি করেছিলেন সত্যজিৎ— সেটাই কি সমালোচকদের পছন্দ হয়নি? পুরনো পত্রপত্রিকা ঘেঁটে ছবিগুলির সমালোচনা পড়লে তা-ই মনে হয়, যদিও আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়। আসল প্রশ্ন হল, শেষ জীবনে কেন পথ পরিবর্তন করে পরিচিত এলাকার বাইরে গিয়ে স্পষ্টত সামাজিক ছবি তৈরিতে মনোনিবেশ করেছিলেন সত্যজিৎ?

বলা হয়, পাঁচ বছরের দীর্ঘ অসুস্থতার পর ১৯৮৮-তে সত্যজিৎ পুনরায় ছবি করতে ফিরে এসে স্পষ্টত সামাজিক ছবি তৈরি করেছিলেন কতকটা বাধ্য হয়েই। ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে স্টুডিয়োর অন্দরেই প্রধানত শুটিং করতে হত তাঁকে, আর স্টুডিয়োর অন্দরে বহুস্তরযুক্ত কাব্যময় ছবি তৈরি করা খুব কঠিন। যুক্তিটা অবশ্য ধোপে টেকে না। *নায়ক*, *চারুলতা* এবং *মহাপুরুষ*— ষাটের দশকে তৈরি সত্যজিতের এই তিনটি ছবিরই শুটিং প্রায় পুরোপুরি স্টুডিয়োর অন্দরে হয়ে থাকলেও, এগুলির প্রত্যেকটিই বহুস্তরযুক্ত এবং কাব্যময়, স্পষ্টত সামাজিক নয়।

সত্যজিতের পথ পরিবর্তন করার আসল কারণ অন্য। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে যে, গত শতকের আশির দশকই সেই সময়, যখন নানাবিধ সামাজিক ভাঙনের বীভৎস ছবি আস্তে আস্তে স্পষ্ট হতে শুরু করেছিল ভারতে— আর্থিক অসাম্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল দ্রুত গতিতে, দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হচ্ছিলেন দেশের প্রধানরা, উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের 'গর্ব সে কহো হম হিন্দু হ্যায়' স্লোগান ছড়িয়ে পড়ছিল দিকে দিকে, বস্তুবাদের উত্থান বদলে দিতে শুরু করেছিল মানুষের মূল্যবোধ। এই সমস্ত ভাঙন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করেছিল সত্যজিৎকে। ১৯৯১-তে সাংবাদিক (পরবর্তী কালে চলচ্চিত্র পরিচালক) খালিদ মহম্মদকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ স্পষ্ট বলেছিলেন, "...দেশে আজ যে ধরনের দুর্নীতি শুরু হয়েছে— যে সব খবর যেমন বফর্স স্ক্যান্ডাল ইত্যাদি খবরের কাগজে পড়ি, সেগুলো পড়ে শান্তিতে বসে থাকা যায় না। এই ধরনের স্ক্যান্ডালগুলো লোকে আজকাল সহজ ভাবেই নিয়ে নিয়েছে এবং যুক্তি দিয়ে এটাকেই প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে যে, এ ছাড়া কিছু করার নেই।"

প্রায় একই সময়, অন্য একটি সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ জানিয়েছিলেন, "চারপাশে তাকালে, আমি অনুভব করি যে, ব্যক্তিগত সততা, আনুগত্য, উদারতাবাদ, যুক্তিবাদ এবং ন্যায্যতার মতো পুরনো মূল্যবোধের সম্পূর্ণ রূপে মৃত্যু ঘটেছে। দুর্নীতি অন্যায় জেনেও মানুষ এখন তাকে জীবনধারণের উপায় হিসাবে মেনে নিয়েছে।" বস্তুত এই সমস্ত ভাঙন সত্যজিৎকে এতটাই আলোড়িত করেছিল যে, এই সময়ই— সম্ভবত জীবনে প্রথম বার— দুর্নীতি, মূল্যবোধের অবক্ষয় আর হিন্দু মৌলবাদের উত্থানকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বিবৃতিও দিয়েছিলেন তিনি; পত্র মারফত প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন প্রখ্যাত বামপন্থী নাট্যব্যক্তিত্ব সফদর হাশমির হত্যারও।

> "চারপাশে তাকালে, আমি অনুভব করি যে, ব্যক্তিগত সততা, আনুগত্য, উদারতাবাদ, যুক্তিবাদ এবং ন্যায্যতার মতো পুরনো মূল্যবোধের সম্পূর্ণ রূপে মৃত্যু ঘটেছে। দুর্নীতি অন্যায় জেনেও মানুষ এখন তাকে জীবনধারণের উপায় হিসাবে মেনে নিয়েছে।"

সত্যজিতের মনোজগতে যখন সমাজের বিবিধ ভাঙন এতটা তোলপাড় ফেলেছিল, তাঁকে 'শান্তিতে বসে থাকতে দিচ্ছিল না', তখন তাঁর মতো এক সত্যিকারের মানবতাবাদী এবং সৎ শিল্পী একেবারে সচেতন ভাবে তাঁর ছবিতে, সমস্ত কাব্যময়তা সরিয়ে রেখে, সেই ভাঙনের চিত্র সুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়ে তুলবেন— সেটাই কি স্বাভাবিক নয়? ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী যে কাব্যময় নয়, হতে পারে না, সেটা তো আমরা জানি!

সত্যজিৎ সম্পর্কে রবিনসন লিখেছেন, 'হি ওয়াজ় আ রেভলিউশনারি বাই হার্ট'। তাই বলে কি স্পষ্টত সামাজিক ছবি বানিয়ে সত্যজিৎ সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চেয়েছিলেন? মনে হয় না। কারণ, তিনি চিরকালই বিশ্বাস করতেন যে, ছবির মাধ্যমে সমাজে বদল ঘটানো যায় না (একটি সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ বলেছিলেন, "আমাকে একটি ছবির নাম বলুন, যেটা সমাজে বদল আনতে পেরেছে")। কিন্তু এটা ধরে নেওয়া যেতেই পারে, সমসময়ের যে সমস্ত সামাজিক অন্যায় সত্যজিৎকে বিচলিত করেছিল, ক্ষতবিক্ষত করেছিল, সেই সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াটা জরুরি মনে করেছিলেন তিনি।

বহুস্তরযুক্ত এবং কাব্যময় ছবি বানিয়ে সেটা করা অসম্ভব— তত দিনে এই সারসত্যটুকু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত সত্যজিৎ। অতএব স্পষ্টত সামাজিক ছবিই হয়ে উঠেছিল তাঁর হাতিয়ার— 'জনৈক গণশত্রু' ডাক্তার অশোক গুপ্ত, 'ওয়ার্ক ইজ় ওয়রশিপ, অনেস্টি ইজ় দ্য বেস্ট পলিসি' এই প্রবচনে বিশ্বাস করা আনন্দমোহন মজুমদার এবং 'কোনও দিন কূপমণ্ডুক হতে না চাওয়া' মনমোহন মিত্র হয়ে উঠেছিলেন তাঁর মুখপাত্র। ১৯৯১-তে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ জানিয়েছিলেন, "...গত তিন-চারটে ছবিতে আমি নিজের বক্তব্য, নিজের বিশ্বাস, নিজের দর্শন, যাই বলুন না তা চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। যেমন এ বার *আগন্তুক*-এ আমি উৎপলকে বলে দিয়েছিলাম যে, উৎপল, তুমি কিন্তু আমার স্পোকসম্যান, এটা মনে রেখো...।"

সব পেয়েছির দেশে বইতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, "সাধারণত বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে লোকের রক্ষণশীলতা বাড়ে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় হয়েছে ঠিক উল্টো; যত বয়স বেড়েছে ততই তিনি মুক্ত হয়েছেন।" সত্যজিৎ রায়ের শেষ দিকের ছবিগুলি খোলা মনে দেখলে, কথাটিকে একটু পরিবর্তন করে বলা যায়, বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে অনেকটাই নিস্পৃহ হয়ে যায়, কিন্তু সত্যজিতের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। নিস্পৃহ হওয়ার পরিবর্তে সত্যজিৎ হয়ে উঠেছিলেন স্পষ্টভাষী এক সমাজচিন্তক, যিনি তাঁর ছবির মাধ্যমে সামাজিক নানা সমস্যা সম্পর্কে সরব হয়ে উঠতে দ্বিধা বোধ করেননি, চেষ্টা করেননি শিল্পের দোহাই দিয়ে ভয়ঙ্কর সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা থেকে বিরত থাকতে।

অর্থনীতি বিভাগ, শিব নাদার বিশ্ববিদ্যালয়